**মহান নেতাঃবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

**উপস্থাপনা**

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় বাংলাদেশের মানুষ ও তাদের কল্যানের জন্য ব্যয় করেছেন।বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে সংঘবদ্ধ করতে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। প্রত্যেক বাংলাদেশীর জন্য জাতির পিতার জীবনী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অপরিহার্য।

**জন্ম ও পরিচয়**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গোপালগঞ্জ বর্তমানে একটি জেলা। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং তাঁর দাদার নাম শেখ আব্দুল হামিদ। তাঁর মাতার নাম সাহেরা খাতুন এবং নানার নাম আব্দুল মজিদ। তাঁর আকিকার সময় তাঁর নানা আবদুল মজিদ বঙ্গবন্ধুর নাম রেখেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং বলেছিলেন এ নাম জগৎ জোড়া খ্যাত হবে। পিতা-মাতা তাকে আদর করে ‘খোকা’ বলে ডাকতেন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। তার বড় বোনের নাম ফাতেমা বেগম, মেজ বোন আছিয়া বেগম, সেজ বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী; তার ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। ভাইবোন ও গ্রামবাসির নিকট তিনি ‘মিয়াভাই’ বলে পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে ১৭ই মার্চ সারাদেশে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়।

**শৈশব**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শৈশব সম্পর্কে তাঁর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান বাংলাদেশের সফল প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা তাঁর ‘শেখ মুজিব আমার পিতা’ গ্রন্থে বলেন,

      “আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে। বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে।”

বঙ্গবন্ধু বলেন,

      “ছোট সময়ে আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম এবং খুব ভাল ব্রতচারী করতে পারতাম।”–(অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

**শিক্ষাজীবন**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাথমিক শিক্ষার শুরু হয় নিজ গৃহে গৃহশিক্ষকদের হাত ধরে। তাঁদের কাছে বঙ্গবন্ধু আরবি, বাংলা. ইংরেজি ও অংক শিখতেন। পরবর্তীতে ১৯২৭ সালে শেখ মুজিব গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন যখন তার বয়স সাত বছর। নয় বছর বয়সে তথা ১৯২৯ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানেই ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জে মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেনীতে ভর্তি হন। ১৯৩৪ থেকে চার বছর তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেন নি। কারণ তার চোখে জটিল রোগের কারণে সার্জারি করাতে হয়েছিল এবং এ থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৪২ সনে এনট্র্যান্স পাশ করার পর ১৯৪৭ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। দেশভাগের পর তিনি ঢকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র ছিলেন।

**বিবাহ**

বিবাহ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলেন,

      “আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়ষ বার তেরো বছর হতে পারে। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে,তখন কিছুই বুঝতাম না। রেণুর বয়ষ তখন বোধহয় তিন বছর হবে।”

**খেলাধুলা প্রিয়**

বঙ্গবন্ধু একজন দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন, এমনকি তাঁর পিতাও ফুটবল খেলা পছন্দ করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা বলেন,

       ‘আমার আব্বার পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি দারুন ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলা খুব পছন্দ করতেন। মধুমতি নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লাহাট যেতেন খেলতে। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন।’-(শেখ মুজিব আমার পিতা)

**মুসলিম সেবা সমিতি**

বঙ্গবন্ধুর একজন স্কুল মাস্টার একটা সংগঠন গড়ে তোলেন যার সদস্যরা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ধান,চাল,টাকা, জোগার করে গরিব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন।বঙ্গবন্ধু সেই দলের অন্যতম সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন,

      “মাস্টার সাহেব গোপালগঞ্জে একটা ‘মুসলিম সেবা সমিতি’ গঠন করেন, যার দ্বারা গরিব ছেলেদের সাহায্য করতেন। মুষ্টি ভিক্ষার চাল উঠাতেন প্রত্যেক মুসলমানের বাড়ি থেকে। প্রত্যেক রবিবার থলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে চাউল উঠিয়ে আনতাম এবং এই চাউল বিক্রি করে তিনি গরিব ছেলেদের বই এবং পরীক্ষার অন্যান্য খরচ দিতেন।”-(অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

এছাড় তার দানশীলতা সম্পর্কে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা বলেন,

      ‘দাদির কাছে শুনেছি আব্বার জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হতো কারণ আর কিছুই নয়। কোন ছেলে গরিব,ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোদ বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে, তাদের ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন।’-(শেখ মুজিব আমার পিতা)

**প্রথম বিদ্রোহ**

এ সম্পর্কে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা বলেন,

      ‘কৈশরেই তিনি খুব অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জে সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর শেখ মুজিব তাঁর কাছে স্কুলঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।’

                                                -(শেখ মুজিব আমার পিতা)

**রাজনীতিতে অংশগ্রহণ**

এ সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর শেখ মুজিব আমার পিতা গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

      ‘গোপালগঞ্জ স্কুল খেকে ম্যাট্টিক পাস করে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। তখন বেকার হোস্টেলে থাকতেন। এই সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়ে মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। এই সময় থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়।

**পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন**

এ সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর শেখ মুজিব আমার পিতা গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

     ‘এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বঙ্গবন্ধু প্রথম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা লগ্নে।’

**কারা জীবন**

৭ মার্চ ২০১৭ বানিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ জাতীয় সংসদে বলেন, বঙ্গবন্ধু সারা জীবনে মোট ৪৬৮২ দিন কারাভোগ করেন। এর মধ্যে ব্রিটিশ আমলে ৭ দিন এবং পাকিস্তান আমলে ৪৬৭৫দিন। বঙ্গবন্ধু ছাত্রাবস্থায় ১৯৩৮ সালে প্রথম কারাগারে যান।

**ছাত্রলীগ গঠন**

পাকিম্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও নঈমউদ্দিন আহমেদ মিলে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন,

       ‘১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে ফজলুল হক মুসলিম হলের এ্যাসেম্বলি হলে এক সভা ডাকা হলো, সেখানে স্থির হল একটা ছাত্র প্রতিষ্ঠান করা হবে। যার নাম হবে ‘পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ’ –

                                                     (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

**আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন**

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সাধারন সম্পাদক ছিলেন শামছুল হক এবং বঙ্গবন্ধু ছিলেন জয়েন্ট সেক্রেটারি। ১৯৫৩ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর দলটির নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলেন,

      “শেষপর্যন্ত হুমায়ুন সাহেবের রোজ গার্ডেন বাড়িতে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়েছিল। শুধু কর্মীরা না, অনেক রাজনৈতিক নেতাও নেই সম্মেলনে যোগদান করেন। সকলেই একমত হয়ে নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন; তার নাম দেওয়া হলো, ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি, জনাব শামছুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং আমাকে করা হলো জয়েন্ট সেক্রেটারি।”

**ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ**

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করেই বাংলা ও বাঙালিকে পদাবনত রাখার পরিকল্পনা করে। প্রথমেই আঘাত হানে ভাষার ওপর। তারা উর্দূকে রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করেন এবং এর প্রেক্ষিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু আমতলায় সভাপতির হিসেবে ভাষণ প্রদান করেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন,

       ‘১৬ তারিখ সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রসভায় আমরা সকলেই যোগদান করালাম। হঠাৎ কে যেন আমার নাম প্রস্তাব করে বসল সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য। সকলেই সমর্থন করল। বিখ্যাত আমতলায় এই আমার প্রথম সভাপতিত্ব করতে হলো’-

                                                     (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু জেলে থাকাকালীন অবস্থায় ভাষার জন্য অনশন শুরু করেন। পরবর্তীতে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি আবার আন্দোলন শুরু করনে।

বঙ্গবন্ধু বলেন

      ‘আমি সাধারণ সম্পাদক (আওয়ামী মুসলিম লীগের) হয়েই একটা প্রেস কনফারেন্স করলাম। তাতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে এবং যারা ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ হয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান এবং যারা অন্যায়ভাবে জুলুম করেছে তাদের শাস্তির দাবি করলাম’

                                                     (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

**যুক্তফ্রন্ট**

পকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পকেট সংগঠনে পরিণত হলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে শেরেবাংলা, ভাষানী ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর চারটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।,যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়। এই নির্বাচনে প্রথমবারের মত অংশগ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক সরকার গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু সর্বকনিষ্ট মন্ত্রী হিসেবে সমবায় ও কৃষিঋণ মন্ত্রণলায়ের দায়িত্ব লাভ করেন।

**কারাগার থেকে কারাগারে**

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির চারদিন পর বঙ্গবন্ধুকে নিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়। প্রায় ১৪ মাস আটক রাখার পর মুক্তি পান তিনি। তবে আবার জেলগেট থেকে তাঁকে আটক করা হয়। প্রায় দুই বছর করাগারে থাকেন এসময়। ১৯৬১ সালে হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি মুক্তিপান। ১৯৬২ সালে জননিরাপত্তা আইনে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন প্রকাশিত হলে বঙ্গবন্ধু এর সমালোচনা করেন এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানান।

**ঐতিহাসিক ছয় দফা**

ছয়দফা কর্মসূচি  পাকিস্তানের দু’অংশের মধ্যকার বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচি। তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবহেলা ও ঔদাসীনতার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ প্রধান [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান](http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8,_%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81_%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B0) সোচ্চার হন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের জতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। ছয় দফা দাবির প্রথম দফা ছিল ‘লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে’

**আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা**

পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ প্রধান  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্মরত ও প্রাক্তন সদস্য এবং ঊর্ধ্বতন সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তারা ভারত সরকারের সহায়তায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ভারতের ত্রিপুরার আগরতলা শহরে ভারতীয় পক্ষ ও আসামি পক্ষদের মধ্যে এ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে মামলায় উল্লেখ থাকায় একে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এ মামলা এবং এর প্রতিক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ৩৫ জনকে আসামি করে পাকিস্তান দন্ডবিধির ১২১-ক ধারা এবং ১৩১ ধারায় মামলার শুনানি শুরু হয়। মামলায় শেখ মুজিবকে ১ নম্বর আসামি করা হয় এবং ‘রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান গং’ নামে মামলাটি পরিচালিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের তীব্র আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার অচিরেই মামলাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

**গণঅভ্যুত্থান**

১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ, বাঙালির ম্যাগনাকার্টা। ১৯৬৭ সালের ১৬ জুন নির্ভিক সাংবাদিক তোফাজ্জল হোসেনের ইত্তেফাক পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ২৩ জুন রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা করে তাদের উপর নির্যাতন করা হয়।ফলে সারা দেশে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারী ছাত্র সমাজ ঐতিহাসিক ১১ দফা দাবি উত্থাপন করে। ৮ জানুয়ারী ৮ টি রাজনৈতিক দল নিয়ে DAC গঠিত হয়। ২০ জানুয়ারী ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। আন্দোলন তীব্র হয়। ১৫ ফেব্রয়ারী আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে কারাগারের ভেতরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রয়ারী ১৯৬৯ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. শামছুজ্জোহা কে হত্যার ফলে আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২৪ জানুয়ারী সারা দেশে গণ-আন্দোলন হয়।

**বঙ্গবন্ধু উপাধিলাভ**

গণআন্দোলনের মুখে সরকার ২২ ফেব্রুয়রী ১৯৬৯ তারিখে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রেসকোর্সের ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসংবর্ধনা দেয়। সভায় তৎকালীন ছাত্রনেতা, ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ লাখো জনতার উপস্থিতিতে তাঁকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

**বাংলাদেশ নামকরণ**

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন,

      “জনগনের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্বপাকিস্তানের পরিবর্তে ‘বাংলাদেশ’ হবে”

**৭০ এর নির্বাচন**

১৯৭০ সালের ৬ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু আওয়ামীলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহনের সিদ্ধান্ত নেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা, স্লোগান ছিল ‘জয় বাংলা’ আর ঘোষণাপত্র ছিল ছয় দফা। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে নৌকার পক্ষে গণজোয়ার তৈরি হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি লাভ করলেও আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। এ জন্যই ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে পাকিস্তানের মৃত্যুর বার্তাবাহক বলা হয়।

**অসহযোগ আন্দোলন**

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল এক ব্যক্তি এক ভোট নীতির প্রথম নির্বাচন। ৩ মার্চ ১৯৭০ সালে আ.স.ম. আবদুর রব বঙ্গবন্ধুকে ‘জাতির পিতা’ উপাধি প্রদান করেন। এই সমাবেশে বক্তৃতা কালে বঙ্গবন্ধু আসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

**৭ই মার্চের ভাষণ**

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে রোজ শুক্রবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ভাষণ প্রদান করেন। সময় বিকাল ৩ট ২০ মিনিট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এর ব্যাপ্তিকাল ছিল ২৩ মিনিট তবে ১৮-১৯ মিনিট রেকর্ড করা হয়। রেকর্ড করেন এ এইচ খন্দকার এবং চিত্র ধারণ করেন আবুল খায়ের এমএনএ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫ম তফসিলে জাতির পিতার এ ভাষণ সন্নিবেশিত হয়। এ ভাষণেই বঙ্গবন্ধু বলেন “আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।” ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু ৪ দফা দাবি তুলে ধরেন। যথাঃ

১. প্রথমে মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে।

২. সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে।

৩. যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।আর

৪. জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

১৩ নভেম্বর ২০১৭ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ২৬টি বাক্যের বিশ্লেষণ করে “বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: রাজনীতির মহাকাব্য” শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গ্রন্থটি প্রকাশ করে-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। ৩০ অক্টোবর ২০১৭ ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে “ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারী হেরিটেজ” বা “বিশ্ব প্রামাণ্যের ঐতিহ্য” হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ পর্যন্ত বিশ্বে মোট ৪২৭ টি নথি এতে যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি ইউনেস্কো ঘেষিত ৭৮টি ঐতিহাসিক দলিলের মধ্যে ৭ই মার্চের ভাষণ ৪৮ তম। ইউনেস্কোর এযাবৎ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৪২৭টি প্রামান্য ঐতিহ্যের মধ্যে প্রথম অলিখিত ভাষণ এটি। স্বীকৃতির সময় ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ছিলেন ইরিনা বোকোভা। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জ্যাকব এফ ফিল্ড তার  'We Shall Fight on the Beaches: The Speeches That Inspired History'   গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় ভাষনটি যুক্ত করেন।৭ মার্চের ভাষনকে আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে যুদ্ধকালে দেয়া বিশ্বের অন্যতম অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তৃতা বলা হয়। ভাষণটি এ পর্যন্ত মোট(২০১৭) ১২টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

**স্বাধীনতার ঘোষনা**

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ ঢাকাসহ সারাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীরা নিরীহ মানুষদের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। শুধু ঢাকাতেই ৫০ হাজারের বেশী মানুষ হত্যা করে তারা। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার আগে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ২৬শে মার্চ চট্রগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম এম.এ.হান্নান নিজের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা পাঠ করেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের ভূমিকাতে বলেন,

      ‘১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে স্বাধীনতার ঘোষনা দেওয়ার পরপরই আমাদের ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কের পাকিস্তনি সেনাবাহিনী হানা দেয় এবং আমার পিতাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।’

**মুজিবনগর সরকার**

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার ভবেরপাড়া গ্রামের আম্রকাননে মুজবনগর সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ দেশ-বিদেশের ১২৭ জন সাংবাদিকের সামনে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তবে বঙ্গবন্ধু জেলে থাকার কারনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দ্বায়িত্ব পালন করেন। মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে মুজিবনগর সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করে।

**স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি**

দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ্ শহীদ ও দুই লক্ষ্ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমারা স্বাধীনতা লাভ করি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ৯৩ হাজার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রেসকোর্সের ময়দানে আত্মসমর্পন করে। প্রতিষ্ঠিত হয় জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ। আর এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ছিলেন বঙ্গপন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

**স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সংবিধান রচনা**

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর ২২ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকার ঢাকায় এসে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। ১০ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধান রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১১ জানুয়ারী ১৯৭২ স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘অস্থায়ী সংবিধান’ আদেশ জারি করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। ১০ এপ্রিল ১৯৭২ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিল সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং একমাত্র মহিলা সদস্য ছিল রাজিয়া বানু।খসড়া কমিটি ৪৭টি বৈঠকের মাধ্যমে খসড়া চুড়ান্ত করে। ১২ অক্টোবর ১৯৭২ সালে খসড়া সংবিধান গণ পরিষদে উত্থাপন করা হয় এবং ৪ নভেম্বর ১৯৭২ (১৮ কার্তিক ১৩৭৯) তা গৃহীত হয়। প্রতি বছর ৪ নভেম্বর সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৫ ডিসেম্বর সংবিধানে স্বাক্ষর করা হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্য়কর হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে মোট ১টি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৭টি তফসিল রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৪টি। এ পর্যন্ত সংবিধানে মোট ১৭ বার সংশোধনী আনা হয়েছে। ৫ম তফসিলে জাতির পিতার ৭ মার্চের ভাষণ, ৬ষ্ঠ তফসিলে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ৭ম তফসিলে মুজিবনগন সরকার কর্তৃক জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সন্নিবেশিত হয়েছে।

**ফিদেল কাস্ত্রের সাক্ষাত**

১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাতের পর কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন,

“আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতায় তিনিই হিমালয়।’

**সংবিধান সংশোধন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার**

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর রেসকোর্স ময়দানে এক ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার ঘোষনা দেন। Bangladesh Collaborators (Special tribunals) Order, 1972  নামে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য প্রথম আইন পাস হয়। পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আমলে সংবিধান মোট ৪ বার সংশোধন করা হয়। যুদ্ধবন্দীদের বিচার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালে প্রথম সংশোধনী আনা হয়। রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি, মেয়াদ ও জরুরী অবস্থার বিধান রেখ ২য় সংশোধনী আনা হয়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চুক্তির আলোকে ৩য় সংশোধনী আনা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

**অসমাপ্ত আত্মজীবনী**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত আত্মজীবনী মূলক প্রথম গ্রন্থ ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’।২০১২ সালের জুন মাসে বইটি ‘দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড’ থেকে প্রকাশিত হয়।বইটির প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমেদ,প্রচ্ছদ সমর মজুমদার এবং গ্রন্থস্বত্ব ‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড.ফকরুল আলম স্যার ‘The Unfinished Memories’  নামে বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। মে, ২০১৭ সাল পর্যন্ত বইটি মোট ৮টি ভাষায় প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ হিন্দি ভাষায় অনুদিত হয়। হিন্দি ভাষায় বইটি অনুবাদ করে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রাণলায়। ১৯৬৭-১৯৬৯ সালে কারাগারে থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু বইটি লেখেন। বইটি লিখতে বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা দেন তার স্ত্রী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৪ সালে ফজলুল হক মনির ড্রয়ার খেকে এর মূল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। ২০০৭ সালের ৭ আগস্ট সাব জেলে থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বইটির ভূমিকা লেখেন। বইটিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর পূর্ব পুরুষদের ইতিহাসসহ বাল্যকাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত নিজের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চট্টগ্রামর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষা বর্ষের পাঠ্যসূচীতে বইটির ইংরেজি অনুবাদ The Unfinished Memories অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

**কারাগারের রোজনামচা**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত আত্মজীবনী মূলক দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘কারাগারের রোজনামচা’।২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান।বইটি ২০১৭ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ৯৮ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে ঐতিহাসিক বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। পাণ্ডুলিপি আনুযায়ী বঙ্গবন্ধু এর নাম দিয়েছিলেন “থালাবাটি কম্বল/জেলখানার সম্বল”।বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা বইটির নামকরণ করেন ‘কারাগারের রোজনামচা’ গ্রন্থটিতে ১৯৬৬-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর কারাবাসের চিত্র তুলেধরেছেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শিল্পী তারিক সুজাত। বঙ্গবন্ধু এই গ্রন্থটিতে তাঁর জেল জীবনের পাশাপাশি জেল যন্ত্রনা, কয়েদীদের অজানা কথা, অপরাধীদের কথা, কেন তারা এই অপরাধে লিপ্ত হলো তার কথা, তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আওয়ামী লীগ নেতাদের দুঃখ দুর্দশা, সংবাদ মাধ্যমের অবস্থা, শাসক গোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন প্রভৃতি তুলে ধরেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম স্যার বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং তা বাংলা একাডেমী থেকে ‘প্রিজন ডায়েরী’ নামে প্রকাশিত হয়। বইটির ভূমিকা লিখেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা ও বর্তমান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বইটির গ্রন্থস্বত্ব হচ্ছে ‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’।

**ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড**

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক বিপথগামী সদস্য ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে বাঙালির ইতিহাসে এক কালিমালিপ্ত অধ্যায় সংযোজিত হয়েছিল। দুই জন পুলিশ কর্মকর্তা সহ এইদিন ঘাতকরা মোট ১৮ জনকে হত্যা করে। তাদের হাত থেকে বঙ্গবন্ধুর শিশু পুত্র শেখ রাসেলও রেহাই পায়নি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের পেছনে ছিল খন্দকার মোশতাক, মেজর ডালিম সহ কতিপয় বিপথগামী সদস্যের হাত। যাদের জন্য বঙ্গবন্ধু সারা জীবন লড়াই করেছেন তাদেরই কিছু বিপথগামী ক্ষমতালোভীর হাতেই রচিত হয় বাংলার ইতিহাসের কলঙ্কময় দিন। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের এই ১৫ই আগস্ট দিনটি জাতি **শোক দিবস** হিসেবে পালন করে থাকে।

**বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার**

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর দায়মুক্তি আইন বাতিল করে আওয়ামী লীগ সরকার এবং ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী আ ফ ম মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মামলা করেন। ২০০১ সালের ৩০ এপ্রিল তৃতীয় বিচারক মোহাম্মদ ফজলুল করিম ২৫ দিন শুনানীর পর অভিযুক্ত ১২ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিশ্চিত করেন। ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর থেকে ২০০৯ সালের ২৪ আগস্ট পর্যন্ত বাদী-বিবাদীর আপিলের প্রেক্ষিতে চার দফায় রায় প্রকাশ হয়, সর্বশেষ আপিল বিভাগ ২০১০ সালের ৫ অক্টোবর থেকে টানা ২৯ কর্মদিবস শুনানি করার পর ১৯ নভেম্বর চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন।এতে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনির ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

**শেষকথা**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনী শীর্ষক উপরিউক্ত দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষিতে আলোচনার শেষপ্রান্তে এসে আমরা বলতে পারি যে, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাথে বেইমানি করেছিল তাঁরই সেনাপতি মীল জাফর ক্ষমতার লোভে, নবাব হওয়ার আশায়। ১৯৭৫ সালেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশর প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁরই মন্ত্রীপরিষদের সদস্য খন্দকার মোশতাক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ক্ষমতা লোভীরা স্থায়ী হতে পারেনি মীর জাফর তিন মাসও ক্ষতায় ছিল না। তেমনিভাবে খন্দকার মোশতাকও তার রাষ্ট্রপতি পদ তিন মাসও রাখতে পারেনি। বাংলার বুকে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে এবং বাকীদেরও হবে ইনশাআল্লাহ।

